

ভক্তকবি জয়দেবে ও কন্দোলী মলো

বীরভূম জেলায় অজয় নদরে তীরে কন্দোলী গ্রাম। কন্দোলী বলিবরে (কন্দোলী) ভক্ত কবি জয়দেবে প্রতাবীর মকর সংক্রান্তির পুণ্য তথিতি বর্ধমানরে কাটোয়ায় যান গঙ্গাস্নান করত। মকর সংক্রান্তি হচ্ছে মুক্তি যোগ, মোক্ষ লাভের যোগ। তাই হাজার হাজার মানুষ দেশ-দেশান্তর থেকে ছুটে আসনে গঙ্গাসাগরে। সাগর সঙ্গমে পবিত্র গঙ্গাস্নান করে তাঁরা জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি চান, মুক্ত হতে চান, কামনা করেন মোক্ষ। এ দৈবীযোগ।

কবি জয়দেবে গঙ্গাস্নান করত কাটোয়া যতেনে পায় হটে। ওই দৈবীযোগে পুণ্য স্নান করা তাঁর জীবনে এক অপরিহার্য ঘটনা।

কিন্তু সবোর দেখা দলি বধিন। পরদিন মকর সংক্রান্তি বা পট্টা সংক্রান্তি। কিন্তু তিনি গঙ্গাস্নান করত যাবনে কী ভাবে? পত্নী পদ্মাবতী সবোর কন্দোলিতে নেই। জয়দেবে পড়লেন মহা সঙ্কটে। বকিলে থেকেই তিনি ভাবছেন, কত মানুষ যাবনে পুণ্য তথিতি গঙ্গাস্নান করত। অথচ এ বছর তিনি যতেনে পারবেন না। গৃহদেবতাকে একা রেখে তিনি যাবনেই বা কী ভাবে। এ সব চিন্তা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মনরে গভীরে দেখা দলি এক বরিট শূন্যতা।

দুঃখে ক্রোধে জরজরতি জয়দেবে রাত্রে কিছু খেতেও পারলেন না। একদিকে তাঁর গৃহদেবতা, অন্যদিকে গঙ্গাস্নান, কী করবেন, কিছুতেই ভবে পলেন না। তারপর এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের ঘোরে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্ন দেখলেন, মা গঙ্গা স্বয়ং এসে তাঁর সামনে আবর্তিত হইছেন। তিনি জয়দেবেকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, ‘জয়দেবে এত দুঃখ করছ কেন? এত আক্ষেপেই বা করছ কেন? কাল সকালে অজয় নদরে কদম্বখণ্ডি ঘাটে আমনিজিই আবর্তিত হব। যখন দেখবে অজয় নদরে স্রোত উজান বইছে, যখন দেখবে স্রোতের গতি উলটো মুখে, তখন সেই স্রোতে দেখবে এক পদ্মফুল ভাসছে, তখন বুঝবে আমনিজিই তোমার কাছে এসেছে। অজয়ের বুকে গঙ্গা এসেছে, বুঝলে?’

স্বপ্ন ভঙে গেলে এক লহমায়। জয়দেবে বহিনায় উঠে বসলেন। ভাবলেন, এও কিসম্ভব? মা গঙ্গা কিনিজিই আসবেন? আর ঘুমতে পারলেন না তিনি আকাশে তখন লক্ষ তারার মলো। গোটা কন্দোলী গ্রাম তখনও ঘুমিয়ে আছে। অন্ধকারে বুকে মাটি, নদী, আকাশ ডুবে আছে নশ্চিন্তে, নীরবে। শুধু একজন চঞ্চল। তিনি কবি জয়দেবে। প্রভাতের অপেক্ষায় তিনি অস্থির চিত্তে বসে আছেন। উষা লগ্নেই তিনি ছুটে গেলেন অজয় নদরে তীরে। আশা নরাশার দোলায় দুলতে দুলতে তিনি কদম্বখণ্ডি ঘাটের জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে আছেন। এ কি, সত্যিই তো অজয় নদরে উলটো স্রোতে ভেসে আসছে পদ্মফুল! ঘাটে তখন ভিড় জমে গেছে। বস্ময় বস্মিফারতি চোখে সবাই দেখছেন সেই অবশ্বাস্য দৃশ্য। জনজীবনে পড়ে গেলে আলোড়ন। ভক্তের ডাকে দৈবী গঙ্গা নজিই এসেছেন। মুহূর্তে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই পবিত্র জলধারায়। জয়দেবেকে কন্দ্র করে জমে উঠল আনন্দের হাট। কন্দোলী বলিব হয়ে গেলে তীর্থ সমান।

সেই থেকে শুরু।

মকর সংক্রান্তির পবিত্র তথিতি অজয়ের জলে গঙ্গাস্নান করত দূর দূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা প্রতীবছর আসতে পারেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের মলিন। আর সেই মলিনই প্রাণের প্রতিষ্ঠা। একটা করে ধর্মীয় উৎসবকে কন্দ্র করে আমাদের দেশে একটা করে মলো গড়ে উঠেছে। তবে মজার কথা হচ্ছে, কন্দোলী তো এখন আর কন্দোলীনয়, জয়দেবে। জয়দেবের জন্ম কোথায়?

আমরা জানি কনৈদুবলি, বীরভূমের কট্টলি, যখনে মাটিনীদী আকাশে মশি আছে জয়দবের নাম। কনিতু কোনও কোনও পণ্ডতি এ নিয়ে তর্ক তুলছেন। তাঁরা কটে বলছেন, জয়দবের জন্ম ওড়িশায়, কটে বলছেন বহারে। এ নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নাই। আমরা জানি, কনৈদুবলি গ্রামে গেলেই আমরা জয়দবকে পেয়ে যাই। মলোর মাঠে পাই, নবরত্ন মন্দিরে পাই, বাউলের আসরে পাই, জনজীবনের মর্মমূলে পাই। কাজেই আমাদের কোনও তর্ক নাই। এখন আর একদিনের মলো বসে না। মলো চলে সপ্তাহ ধরে। মলোর সময় নবরত্ন মন্দিরে আশপোশে যাওয়ার উপায় থাকে না। সর্বত্র শুধু মানুষ আর মানুষ। মলোর প্রাণকনৈদ্রই হচ্ছে এই নবরত্ন মন্দির। আর পুণ্যার্থীর কাছে দুর্নবার আকর্ষণও কদম্বখণ্ডেরি ঘাট। এই গ্রামে বসেই দুশ্চর কঠনি সাধনায় জয়দবে সদ্ধিলাভ করেছিলেন। ফুলেশ্বর ঘাটের কাছে এখনও পাথর আছে। সেই পাথরকে লোকে জয়দবের সদ্ধিধাসন বলেন।

আর ওই যেন নবরত্ন মন্দিরটি মহাকালের ভ্রুকুটিতে আজ জরাজীর্ণ, অযত্নে করুণ চহোরা - সেই মন্দিরও গড়ে উঠেছে জয়দবের কুঁড়েরেরে ওপরই। সেখানেই তো ছিল গৃহদেবতার আসন। অজয়ের তীরেই নয় চুড়ো বশিষ্টি মন্দির অষ্টাদশ শতকে প্রথম ভাগে তৈরি করে দিয়েছিলেন বর্ধমানের রাজমাতা ব্রজসুন্দরী দেবী। মহারাজ কীর্তি চাঁদরে মা। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন জয়দবের গৃহদেবতা রাধাশ্যাম। রাধাশ্যামের ঠিকি বদৌর নীচেই বঁদকি জয়দবের মূর্তি এবং ডানদকি রয়েছে উপবিশিটা পদ্মাবতীর মূর্তি। জয়দবের মূল পুঁথরিও পাণ্ডুলপি আছে এখানে। জয়দবে বা কট্টলিটি নামেই ডাকনি কনে, এই গ্রামের আসল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতো। এই গ্রামে শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে উঠেছে নবিডি। আত্মীয়তার সম্পর্ক। আর মলোর নাম যদিও জয়দবে মলো, কনিতু শেষ পর্যন্ত এটা বাউলদেরই মলো। এখানে এই মলো উপলক্ষে যত বাউল সমাগম হয় তত আর কথাও হয় না। কাজেই শান্তনিকিতে। অদূরেই দুর্গাপুর। মাঝখানে কনৈদুবলি। বরং বলি জয়দবে। অথবা কট্টলি।

গীতগোবিন্দের কবি ‘প্রলয় পয়োধিজলে’ দাঁড়িয়ে যেন মহাকালের ভ্রুকুটিতে অগ্রাহ্য করে মানুষের প্রাণে এসে আসন করে নিয়েছেন। বন্যায় কট্টলি ডুবে যায়, প্রলয় জলে ভেঙে পড়ে ঘরবাড়ি, অজয় হয়ে ওঠে সর্বনাশ। কনিতু তবুও জয়দবে অম্লান। বন্যার জল নমে যায়, খরায় আগুন নভি যায়, দুঃখের কালরাত্রি শেষ হয়, সুখের জীবন হয় মর্যমান। তবু জয়দবে বঁচে থাকেন। কবি জয়দবে, সাধক জয়দবে। কালজয়ী জয়দবে, মানুষ জয়দবে। মানুষের বড় আপনজন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ। এই বাংলায় তখন যেন রাজবংশের রাজত্ব। বল্লল সনের পুত্র লক্ষ্মণ সনে ‘গট্টেশ্বর’ উপাধিধারণ করেন। সনে রাজারা ছিলেন শিব, কনিতু লক্ষ্মণ সনে (১১৭৯-১২০৫) হলেন বৈষ্ণব ধর্মনারাগী। তাঁরাই রাজসভার প্রধান ঐশ্বর্য ছিলেন ‘গীতগোবিন্দের’ কবি জয়দবে। ‘শ্রীমদ্ভাগবত’ এবং ‘ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ’ অনুসরণ করে কবি জয়দবে সেই প্রথম রাধাক্ষণের প্রমেলীলা অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেন। কট্টলির এক দরদির ব্রাহ্মণের সন্তান জয়দবে। তাঁর পতি মৃত্যুর ঠিকি আগে তাঁকে বললেন, ‘তোমার জন্ম কিছুই রেখে যেতে পারলাম না। তুমি লিখোপড়া শিখি, সঙ্গীত বদ্যি আয়ত্ত করছে - এই তোমার সম্পদ। আমার বিশ্বাস সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চার মাধ্যমেই তুমি একদিন খ্যাতি অর্জন করবে।’

পতিকের হারিয়ে জয়দবে হয়ে পড়লেন শোকাচ্ছন্ন, কথাও যান না, কারও সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তাও বলেন না। এমন সময় ওই গ্রামেরই মোড়ল নরিঞ্জন চাটুজ্যে এসে তাঁর কাছে হাজরি, বললেন, ‘শোন জয়দবে, তোমার বাবা আমার কাছে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। সুদে আসলে টাকার অঙ্কটা নহোত কম নয়। টাকাটা আমার এখনই অত্যাঁত প্রয়োজন।’

জয়দবের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। পতির শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করে তিনি পতিঋণ শোধ করার জন্য তৎপর হলেন। শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীদের সাক্ষী রেখে তিনি পতিঋণ শোধ করার জন্য নিজের বসতবাটিনরিঞ্জন চাটুজ্যের নামে লিখে দিলেন। এবার তিনি

মুক্ত। সম্পূর্ণ নরাশ্রয় এবং নরালম্ব। সব সময় তিনি রাধাকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন। এক মধুর রসে তিনি যেনে ভাসমান। এভাবেই একদিন এসে উপস্থিতি হলেন জগন্নাথ কৃষ্ণের পুরীধামে।

পুরীতে এসে আপন ভাবে তন্ময় হয়ে এক সময় তিনি এসে উপস্থিতি হলেন জগন্নাথ মন্দিরে। সেখানে এক রূপবতী কিশোরীর কণ্ঠে স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত ভক্তি সঙ্গীত শুনতে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিশোরীর পতিমাতা এক ব্রাহ্মণ দম্পতি। তাঁরা জগন্নাথ দেবের বরে এই কন্যাকে পেয়েছেন, তাই কন্যাকে জগন্নাথ চরণে নব্বিদিন করতঃ এসেছেন। এই কিশোরীর নাম পদ্মাবতী। সাধক কবি পদ্মাবতীর গানে এবং রূপে মুগ্ধ। পদ্মাবতীও জয়দেবের আকর্ষণে বহিঃবল। এই যখন অবস্থা, তখন একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্নে দর্শন পেলেন শ্রীকৃষ্ণের। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, ‘জয়দেবে তুমি নিজের গ্রামে ফিরে যাও, সেখানে বসে আমার প্রমেলীলা বর্ণনা করে কাব্য রচনা করো।’

এই স্বপ্ন দর্শনের পর জয়দেবে পড়লেন উভয় সঙ্কটে। একদিকে তাঁর ইস্ট দেবতার আদেশ, অন্যদিকে পদ্মাবতীর আকর্ষণ। শেষে পর্যন্ত বৈষ্ণব সাধকের কাছে শ্রীকৃষ্ণের আদেশই হল গ্রহণীয়। পদ্মাবতীর বরিহ-যন্ত্রণাকে নিজের অন্তরে ধারণ করে তিনি চললেন স্বগ্রাম কদ্বলতিতে। প্রেমের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ জয়দেবকে কৃপা করতঃ দ্বিধা করলেন না। শেষে পর্যন্ত কবি জয়দেবের সঙ্কে মলিন হল পদ্মাবতীর। তারপরই শুরু হল জয়দেবের অমর কাব্য ‘গীতগোবিন্দ’ রচনা। শ্রীকৃষ্ণের প্রমেলীলা অনুপম ভাষায় বর্ণনা করে জয়দেবে চরিকালরে জন্ম জনচিহ্নে স্থায়ী আসনের অধিকারী হলেন। ‘গীতগোবিন্দ’ রচনা প্রসঙ্গে এক দ্বিধা কাহিনী প্রচলিত।

শ্রীরাধা অভ্যাস করছেন। কোনও অবস্থাতেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কে কথা বলবেন না। কবি জয়দেবে লিখলেন, ‘স্মর গরল খণ্ডনং, মম শরিসমিগ্ধনম্.....,’ কিন্তু তারপর ? আর যেনে কিছুই লিখতে পারছেন না তিনি। সন্ধ্যা কটে গেলে ভবে ভবে, পরের দিন সকালেও সেই একই অবস্থা। দুপুর হয়ে গেল। তিনি তখনও ভাবছেন, শুধু ভাবছেন। পত্নী পদ্মাবতী আর ধর্ম্য রাখতে পারলেন না, স্বামীকে এসে বললেন, ‘বলো অনেক হয়েছে। এখন যাও স্নান করে এসো। তারপর লিখবো।’

জয়দেবে অগত্যা অজয় নদে স্নান করতে গেলেন। একটু পরেই পদ্মাবতী দেখলেন, জয়দেবে ফিরে এসে আবার লিখতে বসেছেন। এতে তিনি বিস্মিত হলেন, ভাবলেন কবি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন কেন ? কোনও প্রশ্ন করার আগেই জয়দেবে তাঁকে বললেন, ‘স্নান করতেই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ পথে নতুন একটা পদের কথা মনে পড়ল। যদি পরে ভুলে যাই, তাই সটো লিখে রাখার জন্য ফিরে এলাম। তুমি খাবারের ব্যবস্থা করো। আজ আর স্নান করব না।’ পদ্মাবতী আর কথা না বাড়িয়ে স্বামীর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে গেলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর জয়দেবে গেলেন ঘরে বিশ্রাম করতে, আর পদ্মাবতী বসলেন খেতে। কিন্তু এ কি ? এ কয়েকটি সম্ভব ? পদ্মাবতী খাবেন কি, তাঁর তখন দমবন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা।

তিনি দেখলেন, জয়দেবে স্নান সেরে বাড়িতে ঢুকছেন। কোনওক্রমে তিনি বললেন, খেয়েদেয়ে তুমি শূন্য হয়ে গেলে, এর মধ্যে আবার স্নান করতে গেলে কখন ?

এবার হতবাক জয়দেবে, পদ্মাবতী এ সব কী বলছে ? তখন পদ্মাবতী তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। জয়দেবে সঙ্কে সঙ্কে ছুটে গেলেন নিজের পুঁথিটা দেখতে, যেটা অসমাপ্ত রখেই তিনি স্নান করতে গিয়েছিলেন। পুঁথির দিকে তাকিয়ে জয়দেবের চক্ষু স্থির। তাঁর লেখা পঙ্ক্তির নীচেই লেখা রয়েছে, ‘দেহি পদপল্লব মুদারম।’

তাহলে কে এসেছিলেন জয়দেবের বশে ধারণ করে ?

জয়দেবে বুঝলেন, ইনি তো স্বয়ং তাঁরই ইস্ট দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। সাধক কবির দুচোখে তখন ভক্তভাবের অশ্রুধারা। পদ্মাবতী ভাবে বহিঃবল। এত সৌভাগ্য তাঁদের ? তাঁদের ঘরে এসেছিলেন তিনি, যাঁর পথ চেয়ে তাঁরা বসে আছেন অথচ তাঁকে চিনতে পারলেন না। এভাবে তিনি কি আর কোনও দিনই দর্শন দেবেন ? ভক্ত ও সাধক কবি তাঁর অপরূপ সাধনায় এভাবেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। জীবনের শেষে ভাগে ভক্ত কবি জয়দেবে শ্রীধাম বৃন্দাবনে

গয়ি়ে অবস্থান করেন। তিনি আর তাঁর সাধনক্ষেত্রে এবং লীলাক্ষেত্রে বীরভূমরে
কঁদুলতি ফেঁরি়ে আসনেনি। কিন্তু এখনও পটৌষ সংক্রান্তরি প্রচণ্ড শীতরে রাত্রে অজয়
নদরে তীরে তীরে অসংখ্য ভক্ত ও বাউলের মধ্যে তিনি ফেঁরি়ে আসনে। তিনি চরিকালরে
সাধক ও ভক্ত কবি।

